Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.137-144
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

Corona: Its Adverse Effect upon Human Civilization

Dr. Anirban Sahu
Assistant Professor & Head of the Department of Bengali Language & Literature at Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi, Jharkhand, India.

Abstract:

Human existence is always threatened by the attack by deadly virus. Human beings have the experience of fighting with different natural disasters and pandemic. During primeval days when science was not in an advanced stage, human beings had to die helplessly under such attacks. But with the advancement of science and technology, human civilization has shrugged off the adverse effects of such attacks. Virus attack and spread of deadly disease was a common phenomenon in medieval and old age. Such attacks and pandemic like situation influenced the normal flow of life in an immense way, halting the normal flow of social, economic and other functions of life. The total cultural phenomenon gets changed and people begin to think about in a new way leaving a deep imprint upon life. The medieval history of human civilization witnessed a large number of attacks by diseases like cholera and plague. People had no chance of surviving once attacked by such deadly diseases. The fear of people was such that people began to flee their homes and cities after hearing about the attack of plague or cholera in that place. The horror of such deadly diseases and pandemic like situation becomes over with the inventions of vaccine and effective medicines against such diseases. Human beings begin to think that such viruses will not be able to destroy human existence with its attacks. But the same old horrific pandemic like situation returns to human civilization with the attacks of Corona virus. Originated from China, this deadly virus has stalled the normal flow of human life with the return of phenomena like lock-down, social-distancing. The pride of human civilization upon the power and perfection of its science and technology has been hurt. People are scared of the onslaught of Corona virus. Nearly two years have passed with this situation. People are gradually trying to get back their lost momentum of life and step forward to the way to success. The present paper maps in detail the human struggle during this entire Corona period and the process of their overcoming this pandemic situation. The paper is also aimed at recording the effect of the attack of Corona virus upon the cultural spheres like literature, politics, business, religion etc.

Keywords: virus, lockdown, pandemic, human-isolation, vaccination.

সাম্প্রতিক কালে মানব সভ্যতার ইতিহাসে মারমুখী এক ভয়ংকর করোনা ভাইরাসের উদ্ভব হয়েছে — তা একান্তই অপ্রত্যাশিত ও মর্মান্তিক এক চরম আক্রমণ। প্রায় দুই বছরকাল অতিক্রান্ত, তবুও মহামারীর আতঙ্ক থেকে আজও সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তি ঘটেনি। গত ২০২০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকেই শুরু হয়েছিল করোনার প্রাদুর্ভাব। এই মহামারীর প্রথম ইংগিত এসেছিল চীন ও ভিয়েতনাম থেকে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয় প্রথম চীনে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের উহান শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ভীড় জমতে শুরু করল সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টে ধুঁকতে থাকা মানুষজনে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি উহান শহর তখন ভাইরাসের তীব্র আক্রমণে কাবু। হাসপাতালগুলি অসংখ্য মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হতে লাগল ক্রমশ। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাণপণে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করছেন, ঠিক সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে উহানের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল করোনা ভাইরাস। চীনের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন — উহানের পরিস্থিতি ভয়ংকর। যাইহোক, পরবর্তী সময়ে চীন নিজের ঘর সামলে নিলেও কিন্তু এই ভয়ংকর মারণ রোগ ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তবে উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ার সত্যতা বিষয়ে কমিশনের পর কমিশন বসিয়েও আজ পর্যন্ত সত্যতার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত জানা যায়নি।

যাইহোক, এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১৯১৮ সালে শুরু হয়েছিল এক ভয়াবহ অতিমারী যা 'স্প্যানিশ ফ্লু' নামে পরিচিত। এটি ছড়িয়েছিল সারা পৃথিবীতে। ভারতে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের। ভাবতে অবাক লাগে যে সেই সময়ে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় তেত্রিশ কোটি। অথচ বর্তমানে ভাইরাস রোগীর মৃত্যুর হার প্রতি দশহাজারে ১.৫ জনের। কোভিড মহামারীতে সাধারণত বয়স্ক মানুষ বেশি করে আক্রান্ত হয়েছেন ; কিন্তু একশো বছর আগে সংঘটিত 'স্প্যানিশ ফ্লু'তে বেশি সংখ্যায় আক্রান্ত হয়েছিল কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়স্ক মানুষদের। শুধু তাই নয়, পনেরো শতকে বিশ্বসেরা নাট্যকার শেক্সপিয়রের জন্ম হয়েছিল 'প্লেগ'-রোগের আবহে। কবির জন্ম হয়েছিল কোয়ারেন্টাইনের পরিবেশে। এর বহুকাল পরে ১৯৬৬ সালে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অরুণাচল প্রদেশে দেখা দিয়েছিল গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাব। গুটি বসন্তে আক্রান্ত গ্রামগুলিকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। তারপরে আবিষ্কৃত হল টীকা। বলাবাহুল্য, এই কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি কিন্তু সর্বকালীন। বর্তমানে করোনা ভাইরাস — যার প্রবর্তিত বহুজন পরিচিত নাম 'কোভিড ১৯'।

এছাড়াও আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঘটিত নানা মহামারীর বিষয়ে বহু তথ্য জানতে পারি। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'মড়ক' - মহামারীর দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয়পর্বে প্লেগ রোগের উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ চরিত্র চিত্রণে মহামারীর প্রকোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে উল্লেখ আছে মহামারীর প্রকোপে বহু মানুষের প্রাণহানির কথা।

১৮৯৮ সালে কোলকাতাতে যখন ব্যাপকভাবে প্লেগ মহামারী দেখা দেয় তখন বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তাছাড়া ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজার থেকে মহামারীতে আক্রান্তদের সেবা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এছাড়াও আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও প্লেগ মহামারীর উল্লেখ আছে। উপন্যাসে উল্লিখিত চরিত্র জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল প্লেগ রোগে। এমনকি রবীন্দ্র স্নেহধন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'আমরা' — কবিতায় মন্বন্তরের উল্লেখ করে দৃঢ় চিত্তে

বিধাতার নিকট আশিষ কামনা করেছেন। তিনি ঐ মন্বন্তরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঁচার মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণ করে সদর্পে ঘোষণা করে বলেছেন, —

"মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।"

এ ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ড্যানিয়েল ডিফোরের লেখা 'জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার' গ্রন্থ থেকে ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত প্লেগ জনিত মহামারী রোগের তথ্য জানতে পারি। ১৬৬৫-৬৬ 'দি গ্রেট প্লেগ অব লন্ডন', সমগ্র লন্ডনবাসীদের মনে ভয়াবহ আতঙ্কের ভীতি জাগিয়ে তুলল।

তখনও পর্যন্ত লন্ডনবাসীরা এই ভয়ংকর মহামারীর মূল রহস্য ধরতে পারে নি। এর আগে আমরা বলেছি, শেক্সপীয়রের জন্মলগ্নে মহামারীর খবর। ১৫৬৪ সালের এপ্রিল মাসে শেক্সপীয়রের জন্মলগ্নে লন্ডনের সর্বত্র প্লেগ-মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সরকারী তথ্য অনুযায়ী লন্ডনের এক ষষ্ঠাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এক অভাবনীয় সংকটপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়রের জীবন গড়ে উঠেছে। আর এই কারণেই শেক্সপীয়রের বিখ্যাত লেখা 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' থেকে শুরু করে 'টুয়েলফথ নাইট', 'কিং লিয়র' ও 'ম্যাকবেথের' ন্যায় নাট্যসাহিত্যে প্রভাব পড়েছে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব। দীর্ঘ সময় ব্যাপী থিয়েটার বন্ধ থাকে। কারণ জনগণ বুঝতে পেরেছিল জমায়েত থেকেই এই ভাইরাস জনিত রোগ দ্রুত ছড়ায়। তত্ত্ববিদ গ্র্যান্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঐ মহামারীতে ৬৮ হাজার ৫৯৬ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে দেশের প্রশাসক বাইরে থেকে আসা মানুষদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মৃতের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। প্লেগ রোগীদের ঘর থেকে বের করে এনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হত। যাইহোক, সবকিছুর যেমন শুরু আছে, তেমনি শেষও আছে। ফলস্বরূপ লন্ডন থেকে এই প্লেগ রোগের ভয়াবহতা একদিন অপসারিত হয়েছিল।

যাইহোক, এবারের ভাইরাস প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ২০২০ - তে ভাইরাস রোধ কল্পে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে নির্দেশ দেওয়া হল — নিয়মিত মাস্ক পরা ও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলা। ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখা। এই মারণ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলেন রাজ্য সরকার গুলিকে সীমিত সময়ের জন্য লকডাউনের ব্যবস্থা করা। সেই অনুযায়ী বন্ধ হল আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল, বন্ধ হল ট্রেন ও বাস চলাচল। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকরা যে যার নিজের জায়গায় বন্দী হল। ফিরতে পারল না নিজ গৃহে। সরকারী প্রচেষ্টায় তাদের ফিরিয়ে আনা হল বটে, কিন্তু নিভৃতবাসে রাখার কোন ব্যবস্থাই হল না। যার ফলে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে শহরাঞ্চলগুলিতে ভারতের সব রাজ্যেই কমবেশি ছড়িয়ে পড়ল এই মারণ রোগ। রোগে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিয়মিত মাস্ক পরা ও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলা — সবই জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হল ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই বিধি না মানায় করোনার প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেল না। ফলে সরকারী নির্দেশে শুরু হল লকডাউনের পর্ব। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই করোনার প্রভাব নিম্নমুখী হতে শুরু করল। মানুষ ভাবতে শুরু করল— এবার বুঝি করোনা মুক্ত হবে দেশ।

এইভাবে একটা বছর আমরা পেরিয়ে এলাম ঠিকই, কিন্তু নতুন করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ পুনরায় আছড়ে পড়ল সারা দেশে। ভয়ংকর রূপ ধারণ করল করোনার আক্রমণ। তবুও মানুষ আশার আলো দেখতে পেল। কোভিডের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০২১ এর জানুয়ারী থেকে শুরু হল টীকাকরণের কাজ। এপ্রিল থেকে শুরু হল লক্‌ডাউন।

আর মাত্র দুইমাস পরেই বিদায় নেবে ২০২১। কিন্তু এরই আবহে শোনা যায় আপনজনদের হারানোর ক্রন্দনধ্বনি। ছুটে চলেছে অ্যাম্বুল্যান্স। মৃতদেহ সৎকারে অব্যবস্থা, আবার মৃতদেহ যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ঘরে অসুস্থ মানুষের ভীড়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের চিত্রটাই অন্যরকম। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। অনেক আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। করোনার দ্বিতীয় পর্বে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব ছিল না সিংহভাগ মানুষের। আবার যারা মাস্ক পরল, তারা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে মাস্কের অপব্যবহার করতে শুরু করল। সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে উৎসবে মেতে উঠল মানুষ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেতে উঠল। এ ছাড়া মহামারীর পর্বে কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে মহামারীর সংক্রমণ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে আক্রান্ত হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর্বে দেখা গেল সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এর ফলে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করল। টেস্ট কিটের অভাবে পরীক্ষা করতে না পারার ফলে অজান্তে বহু আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। এ ছাড়া অক্সিজেনের অপ্রতুলতা কোভিড রোগীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ। করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা দিল সমস্যা। যে পরিমাণ টীকা সরবরাহের কথা ছিল — সংস্থাগুলি তা প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারল না। অবশেষে দেশের সকল অধিবাসীকে টীকা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় আনা হল। বর্তমানে ঐ কর্মসূচী ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োজনীয় কিট ও বিভিন্ন আর্থিক প্যাকেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার। আক্রান্ত রাজ্যগুলিতে লক্‌-ডাউনের ফলে সংক্রমণ বেশ কিছুটা কমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। তবে একই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন - আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশগুলি সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় — সেখানকার মৃত্যুর হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানো গেছে অনেকটা। এই সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকগণ লক্‌-ডাউনের জন্য নিজেদের কাজ হারালেন। ফলে তারা কর্মহীন হয়ে স্বভাবতঃ নিজের বাসস্থানে ফিরতে চাইলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিকদের জন্য ‘শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন’ চালনার ব্যবস্থা করলেন। ফলে কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাডু, রাজস্থান , বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলির পরিযায়ী শ্রমিকেরা উপকৃত হলেন। একই সঙ্গে সারা দেশে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষদের জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রসঙ্গে WHO প্রধান টেড্‌রস আধানম গেব্রেসিয়াস আমাদের দেশের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। এ ছাড়াও সামাজিক দূরত্ব, নাক মুখ বন্ধ মাস্ক ব্যবহার, স্যানিটাইজেসন — প্রভৃতি বিষয় গুলির উপর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশ পালনের ফলে যোগ্যতার সঙ্গে আমরা করোনার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে কোয়ারেন্টিনে থাকা — করোনা সংক্রমণ রোধে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বিশেষত করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ যখন সমগ্র বিশ্বে মহামারীর রূপ নিয়েছে, তখন ভারত সরকারের সফল নীতি গ্রহণের ফলে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রভাবকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রেণ আনা গেছে। এই দ্বিতীয়বার সংক্রমণ কালে দুটি ভ্যাকসিন পাওয়ায় জনগণ অনেক

উপকৃত হয়েছেন। একটি ভ্যাকসিন টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে 'কোভিশিল্ড' ও অন্যটি হল দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারত বায়োটেক-এর তৈরি 'কোভ্যাকসিন'। দেশে করোনা মোকাবিলায় মেডিক্যাল কর্মীদের সর্বপ্রথম টীকাকরণের ব্যবস্থা করেন। তারপর অসুস্থ ও বয়স্কদের জন্য টীকাকরণে কর্মসূচী গৃহীত হয়। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন, নেপাল, বাংলা দেশ ও শ্রীলংকাকে ভ্যাকসিন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। করোনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারতের এই বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের সাফল্য আগামীদিনে ইতিহাস তৈরি হবে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রকোপে জনগণ যখন জর্জরিত ঠিক তখনই নতুন এক প্রাণনাশের জীবাণুর খবর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই জীবাণুর কেতাবী নাম — 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' যার বৈজ্ঞানিক নাম 'মিউকর মাইসেটিস' । এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হল, নাকের ভেতর অংশ ক্রমশ কালো হয়ে যাবে এবং এই রোগে সংক্রমিত রোগীর চোখ ফুলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গবেষকদের মতে এই ফাঙ্গাস আগে থেকে মানব দেহের অভ্যন্তরে নীরব অবস্থায় অবস্থান করে। যখন মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তখনই এই ফাঙ্গাস শরীরে আক্রমণ করে। এই ভয়ংকর ভাইরাস অকস্মাৎ জীবনঘাতী হয়ে উঠতে পারে। তবে এও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে কারণে করোনা ভাইরাস দ্রুত হাঁচি কিংবা কাশির মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে — সে অর্থে এ ধরণের ফাঙ্গাস এভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। তবে অনেক চিকিৎসকদের মত হল, যাদের শরীরে হাই ব্লাডসুগার কিংবা ডায়বেটিস আছে তাঁদের সহজে এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। আসলে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের আনুষঙ্গিক রোগ হিসাবে দেখা দেয়। কোভিড - ১৯ মহামারীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে মূলত কানাডা, আমেরিকা, চীন ও জার্মান দেশগুলিতে। তবে ভারতে দেখা গেছে প্রায় ৮০ ভাগ কোভিড রোগীদের দেহে এই 'মিউকর মাইসেটিস' রোগের লক্ষণ দেখা গেছে। কিন্তু এদের অনেকেই স্টেরয়েড নেননি কিংবা ডায়াবেটিসের রোগী নন। আসলে আমাদের দেহে যখন প্রতিরোধ ক্ষমতা তীব্রভাবে হ্রাস পায় বলেই এই রোগ সহজে আক্রমণ করে এবং মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। তাছাড়াও কোভিড - ১৯ রোগী আই.সি.ইউ-তে থাকাকালীন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে কোন রোগের স্বাভাবিক গতিতে ইনফেকশন তৈরি হতে পারে। তবে এই ফাঙ্গাস রোগটি তাই বলে মহামারীর আকার ধারণ করতে পারবে না।

আমাদের দেশেও এ ধরণের ফাঙ্গাস রোগের দৃষ্টান্ত আছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশ সতর্কতা অবলম্বন করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশিকা জারি করেছে। আগামী দিনে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের খবর শোনা যাচ্ছে। আসলে ব্যাপক টীকাকরণের দ্রুত ব্যবস্থা না করলে এই রোগ বারে বারে ফিরে আসতে পারে। টীকাকরণের ক্ষেত্রে সামান্য ঢিলেমী দেখা যাচ্ছে বর্তমানে সময়ে। এখনও দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে ৬০ শতাংশ মানুষ প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ পাননি। এই সমস্ত রাজ্যে টীকা নেওয়ার প্রশ্নে মানুষের মধ্যে এখনও অনীহা রয়েছে। রাজ্যগুলিকে সেই অনীহা দূর করতে হবে। অথচ সমগ্র দেশে সার্বিকভাবে প্রথম ডোজ প্রতিষেধক দেওয়ার জাতীয় গড় প্রায় ৭২ শতাংশ । এই মুহূর্তে দেশে সংক্রমণ কমে এলেও এখনও বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ত্রিশটিরও বেশী জেলায় সংক্রমণের হার ৬ - ১০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এখনও মাসে দেড় কোটি ডোজও মিলছে না। করোনার প্রথম ঢেউ-এর প্রভাব গ্রামে পড়েনি বললেই চলে। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী ২০২১ এর মে পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২,৬৯,৪৮,৮০০ রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৩,০৭,২৩১ — যা বিশ্বের সর্বাধিক। ফলস্বরূপ কোভিড আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপদমুখী হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এই প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একটি সংবাদপত্রে এই প্রসঙ্গে

মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন,— "অতিমারীর মোকাবিলা করার সঙ্গে যুদ্ধ করার তুলনা চলে না। যুদ্ধে সাফল্য আসে যখন দক্ষ সেনাপতির আদেশ ওপর থেকে আসে এবং প্রশ্ন না করে তা পালন করা হয়। কিন্তু অতিমারীতে প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory democracy) এবং সর্বজনীন আলোচনা (Public discussion) "। (দেশ পত্রিকা: ২রা মার্চ, ২০২১ সংখ্যা)।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ-এর দাপট কিছুটা নিম্নমুখী হলেও সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ-এর আগমনী সুর বাজতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী এই ঢেউ এর প্রকোপ বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে গ্রামাঞ্চলে। তৃতীয় মহামারীর প্রকোপে সংক্রমিত হবে শিশুরা। অথচ এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ শিশুদের জন্যে টীকাকরণের পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। তাই আগের থেকেই শিশুকরোনা রোগীর চিকিৎসায় যাতে কোন প্রকার সমস্যা না হয় — তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি আগাম পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হয়েছে। সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে সংক্রমিত শিশু রোগীদের চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলার। মেডিক্যালের শিশুবিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ শিশুদের চিকিৎসার জন্য নানা 'প্রোটোকল তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সদ্যোজাত শিশু থেকে ১২ বছর পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত শিশুদের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে 'পিকু' এবং 'নিকু' — দুইটি ইউনিট। বলা বাহুল্য, তৃতীয় ঢেউ-এ সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থেকেই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও করোনা যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা বুঝতে পেরেছে দেশ। করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউ-এ জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে — ১ লা এপ্রিল ২০২১ থেকে চলতি বছরে জুনের মধ্যে অনাথ হয়েছে ৩,৬২১ টি শিশু। অন্যদিকে মা কিংবা বাবাকে হারিয়েছে ২৬ হাজার ১৭৬ টি শিশু। এই সব অনাথ শিশুদের লেখা পড়া ও ভরণ পোষণের জন্য আর্থিক দায়িত্বভার নেবে কেন্দ্র। তবুও জনমানসে শিশুদের সংক্রমণে ভীতি দূর হচ্ছে না বলেই জুনের প্রথম সপ্তাহে শিশুদের চিকিৎসায় নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ১৮ বছরের কমবয়সী করোনা আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'রেমডেসিভিয়ারের' মতো ওষুধ প্রয়োগ করা চলবে না। কম উপসর্গ যুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড্ জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ না করাই ভালো। এ ক্ষেত্রে জ্বর ও গলা ব্যথায় ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে।উপসর্গ জোরালো হলে শিশুর অক্সিজেন থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে। শিশুর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অর্গান সাপোর্টের প্রয়োজন হতে পারে। শিশুর অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে ৬ মিনিটের একটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স অন্তত পক্ষে ১২ বছর হতে হবে। অক্সিমিটারের অক্সিজেনের মাত্রা যদি ৯৪ শতাংশের কম হয় — তা হলে ঐ শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করানোই ভাল। শিশুদের এই সংক্রমণ রোধ করতে ইতিমধ্যে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ভারত বায়োটেক্ এই দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে।

২০২০ সালের অসহায়তার দিন অতিক্রম করে ২০২১ সালে ভ্যাকসিন এসে যাওয়ায়, করোনা থেকে কিছুটা ভয় কেটেছে। ইতিমধ্যে সেরাম ইনস্টিটিউট তৈরি করেছে 'কোভিশিল্ডভ্যাকসিন' এবং ভারত বায়োটেক্ তৈরি করেছে 'কো-ভ্যাকসিন'। ভারতে যা উৎপাদিত হয়েছে — তার পুরোস্টক এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে জোর কদমে শুরু হয়েছে টীকা করণের কাজ। প্রথম দফায় ৩ কোটি ও দ্বিতীয় দফায় ২৭ কোটি নাগরিককে টীকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ৫০ বছরের

ঊর্দ্ধে প্রবীণ নাগরিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টীকা দেওয়ার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তবে একথাও ঠিক যে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় টীকার যোগান অত্যন্ত কম। বর্তমানে প্রায় সব রাজ্যের পক্ষ থেকে জোরালো ভাবে দাবি তোলা হয়েছে বিনামূল্যে চাহিদা অনুযায়ী টীকা সরবরাহ করা হোক্।

আনন্দের সংবাদ এই যে, রাজ্যগুলির দাবি মেনে নিয়ে ২১ শে জুন থেকে ১৮ বছরের ঊর্দ্ধে দেশের নাগরিকদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়েছে উৎপাদিত মোট ভ্যাকসিনের ৭৫ শতাংশ কিনবে কেন্দ্র। বাকি ২৫ শতাংশ বেসরকারী হাসপাতাল কিনতে পারবে। কোভিড - ১৯ সংক্রমণ অবশ্যই এই শতকের সবচেয়ে মারাত্মক অতিমারী। এই করোনা ভাইরাস অতিমারীর অবসান কবে হবে — তা সকলেরই অজানা। এই অতিমারীর আঘাতে জর্জরিত মানুষ পুনরায় 'আমফান' ও 'ইয়াস' — নামাঙ্কিত পরপর দুটি প্রাকৃতিক ভয়ানক ঝড় ও জলোচ্ছাসের দাপটে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবনে তৈরি হয়েছে গভীর ক্ষত — যার নিরাময় হয়তো কয়েক দশকে সম্ভব হবে না। হয়তোবা এরূপ বিপরীত পরিস্থিতির আঘাত পর্বে নতুন রূপ ধারণ করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে এই মহামারী। যাইহোক, এ যাবৎ মহামারীর সংকটে আমাদের দেশের জনজীবনে বিশেষতঃ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে যে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়েছে — তা অত্যন্ত ভয়ানক। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকরীর সুযোগ দ্রুত হ্রাসের দিকে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীর সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে কমতে শুরু করেছে। করোনা মহামারীর প্রভাবে এক বছরে ৮.৬ কোটি থেকে ৬.৭ কোটিতে নেমে এসেছে কর্মচারীর সংখ্যা। বলাবাহুল্য, অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ জীবিকা নির্বাহ করত প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মচারী। এদের চাকরীর ক্ষেত্রে কোন প্রকার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা ছিল না। এরাও কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। অথচ স্বাভাবিক সময়ে এদের দ্বারা দেশের উৎপাদন হত প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উৎপাদন, কমে গিয়েছে জাতীয় আয়। শ্রমজীবিদের সংখ্যাও কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। দেশের কোম্পানীগুলির কর্মচারীরা সরাসরি অফিসে গিয়ে কাজ করত। কিন্তু লকডাউনের ফলে ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করতে হচ্ছে। এ ছাড়া বেশ কিছু কর্মচারীদের কাজ থেকে ছাঁটাই করেছে কোম্পানী। এ ছাড়া সাফাই কর্মী, কেয়ার টেকার, করণিক, হোটেল কর্মী, বিমান কর্মচারী কাজ হারিয়ে ঘরে বসে একরকম অনাহারে দিনযাপন করছে। ক্রেতাগণ বাড়িতে বসে অনলাইনে জিনিসপত্র কিনছে। শপিংমলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমের চাহিদা কমে যাচ্ছে। যাইহোক না কেন, কর্মসংস্থানের ওপর মহামারীর প্রভাব পড়েছে বেশি করে। সরকার যদি সঠিক পরিকাঠামো তৈরি করতে পারে যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বন্দর তৈরি, নতুন রেলপথ তৈরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির পরিকল্পনা গ্রহণ করলে — কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, পরিকাঠামো তৈরি হলে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়বে। অতিমারীর কবল থেকে রেহাই পেতে গেলে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

বিশেষত এই মহামারীর কালে সারা বিশ্ব অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি যখন থমকে গেছে, সারা বিশ্বে একটা মন্দার বাজার চলছে — তখন সম্পদ বন্টনের সু-নীতি গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেসরকারী পুঁজি সরকারী সংস্থায় যুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে অবশেষে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হবে। জাতীয় সম্পদ ব্যাহত হবে। এদিকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বাজারে সুদের হার কমছে। জাতীয় আয়ের একটা বিশেষ অংশ ধনবানদের হস্তগত হচ্ছে। তাছাড়া দেশের এই সংকট মুহূর্তে বীমা কোম্পানীগুলি কিংবা ব্যাঙ্কগুলোর বেসরকারীকরণ হলে — কৃষিক্ষেত্রে অথবা সমাজে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হবে। তবে সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারীকরণের

পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে। গত শতাব্দীর মহামারীতে ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমজীবিদের জীবনহানি হয়েছিল — তাতে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান করোনা কালে আগের মত উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করতে প্রথম থেকেই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তবে এই পরিকাঠামোকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

করোনা ভাইরাস অতিমারির দাপট কবে শেষ হবে কিংবা প্রকৃতপক্ষে বিদায় নেবে কিনা — তা গবেষক থেকে শুরু করে আমরা সাধারণ জনগণ কেউই জানি না। প্রাসঙ্গিকভাবে আর এক ভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা কিছুই জানিনা তা হল, কোভিড জীবাণু মিউটেশনের নীরব গতিবিধি। শিক্ষক, আইনজীবি, বিভিন্ন বেসরকারী কোম্পানীতে কর্মরত কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ — সবাই বাড়িতে বসে অন লাইনে কাজ করছেন। আগামী দিনে করোনা থেকে মুক্তি ঘটবে কিনা? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা পুনরায় উন্মুক্ত হয়ে ছাত্র-শিক্ষক বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করতে পারবে কিনা? সমাজ ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগে জনগণ উদ্যোগী হতে পারবে কিনা? — এ বিষয়ে জনমানসে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায়নি।

কোভিড উত্তর পর্বে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের গতিপথ ত্বরান্বিত না হলে দেশ চরম সংকটের মুখোমুখি হবে। শিক্ষায় সচেতনতা কিংবা কাজ হারানো অসংগঠিত স্তরের কর্মীদের পরিষেবা বিষয়ে অতি দ্রুত সরকারকে পজিটিভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি থেকে মানুষ না বাঁচলে — দেশ বাঁচবে না। সবার উপরে মানুষ সত্য-তাহার উপরে নাই।

মানবতার অপর নাম ভালোবাসা। মানুষ মানুষের পাশে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক সাধনার ফলে সব সমস্যা ও সকল অন্ধকার দূর হয়ে নবকলেবরে পূর্ব দিগন্তে উঠবে নতুন সূর্য। আলোকিত নতুন সূর্যের আলোয় আবার ফিরে আসবে নতুন সমাজ ও ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা — গড়ে উঠবে নবগঠিত সমাজ ও সংস্কৃতি। আগামী দিনে তৈরি হবে — এই মহাসংকটকে ঘিরে নতুন ইতিহাস — যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বয়ে আনবে নতুন দিশারী। তাই সবকিছুর উর্দ্ধে ঐক্যবদ্ধ মানুষের জয়গানে মুখরিত হবে সমগ্র ভারত। তাই মানুষের পাশে মানুষই শেষ কথা।

তাই কবির ভাষায় বলি, —

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দেশ পত্রিকা, ২রা মার্চ, ২০২১ সংখ্যা।
২। দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা।
৩। দৈনিক এই সময়, কলকাতা।